History (PG) Second Sem.
Paper – 202

আইন অমান্য আন্দোলন অসহযোগ আন্দোলনের চেয়ে প্রগতিশীল বা অগ্রণী ছিল

রীনা পাল

মহাত্মা গান্ধির নেতৃত্বে অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনই ভারতবর্ষের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসে সর্বপ্রথম সর্বভারতীয় গণবিদ্রোহ হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। গান্ধিজির নেতৃত্বে কোন্ আন্দোলনটি বেশি প্রগতিশীল বা গুণাতীতভাবে অগ্রসরমান ছিল তা ঐতিহাসিক দিক থেকে যথেষ্ট বিতর্কিত বিষয়। তবে ব্যাপ্তি ও লক্ষ্যের দিক দিয়ে বিবেচনা করলে বলা যায় আইন অমান্য আন্দোলন ছিল অনেক অগ্রণী ও প্রগতিশীল। লক্ষ্যের দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় অসহযোগ আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল সরকারকে নিষ্ক্রিয় করা, আর আইন অমান্য আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল সরকারকে সম্পূর্ণভাবে পঙ্গু করা। দুটি সর্বভারতীয় গণ-আন্দোলনই মহাত্মা গান্ধি প্রত্যাহার করায় তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছোতে পারেননি এবং দুটি আন্দোলনই বস্তুত ব্যর্থ হয় এবং ভারতীয় রাজনীতিতে এক বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। কিন্তু তাৎপর্যের দিক থেকে দুটি আন্দোলনই ভারতবর্ষের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। প্রকৃতপক্ষে ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের পর এই দুটি আন্দোলনই ছিল ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা বৃহত্তম সর্বভারতীয় গণ-আন্দোলন। ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহ পরিচালিত হয় হিংসার পথে কিন্তু এই দুটি গণ-আন্দোলন মহাত্মাজির নেতৃত্বে পরিচালিত হয় মূলত অহিংসার পথে। এই দুটি আন্দোলনই ভারতবর্ষের সকল শ্রেণি, বর্ণ ও ধর্মের মানুষকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল এবং সমগ্র ভারতবর্ষ জাতীয়তাবাদের বন্যায় প্লাবিত হয়েছিল।

তবে প্রগতিশীলতার দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় অসহযোগ আন্দোলনের চেয়ে আইন অমান্য আন্দোলন ছিল অনেক বেশি অগ্রণী ও প্রগতিশীল। অসহযোগ আন্দোলনে ডোমিনিয়নের মর্যাদা লাভই ছিল এই আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য কিন্তু আইন অমান্য আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য ছিল পূর্ণ স্বরাজ। ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বরাজের দাবি গৃহিত হয় এবং ৩১ ডিসেম্বর গান্ধি মধ্যরাত্রে ঐতিহাসিক পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি উত্থাপন কহরেন। জওহরলাল নেহরু স্বাধীনতার প্রতীক ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা উত্তোলন করেন। এমনকি যতদিন পূর্ণ স্বরাজ অর্জিত না হয়, ততদন ২৬ জানুয়ারি স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন সংকল্প গ্রহণ করা হয়। অর্থাৎ অসহযোগ আন্দোলনের সময় যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল সে তুলনায় আইন অমান্য আন্দোলনের সময় মানুষ ছিল অনেক সচেতন ও বিপ্লবী পদক্ষেপে বিশ্বাসী। তাই আইন অমান্য আন্দোলনের প্রধান বিঘোষিত নীতি ছিল স্বরাজ। আইন অমান্য আন্দোলনের প্রথম পর্বের আন্দোলনের যে

ব্যাপকতা ও তীব্রতা এবং স্বতঃস্ফূর্ততা দেখা যায় তা ইতিপূর্বে কখনও কোনো আন্দোলনে দেখা যায়নি। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষ এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল। শ্রমিক ও কৃষক ছিল দুটি আন্দোলনেরই প্রধান হাতিয়ার। সাধারণ মুষের ব্যাপকভাবে সমগ্র ভারতব্যাপী মরিয়াভাবে অংশগ্রহণ গুণাতীতভাবে অসহযোগ আন্দোলন অপেক্ষা আইন অমান্য আন্দোলনের প্রথম পর্বকে অভাবনীয় জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক মর্যাদা এনে দিয়েছিল। মহাত্মা গান্ধিও এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে অবসংবাদিত রাজনৈতিক কর্তৃত্বের অধিকারী হয়েছিলেন। অসহযোগ আন্দোলন ছিল অহিংসভাবে সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা। আইন অমান্য আন্দোলন আর এক ধাপ এগিয়ে সরকারের সব আইনগুলিকে অমান্য করা বা ভেঙে ফেলা। অর্থাৎ আইন অমান্য আন্দোলন মহাত্মার নেতৃত্বেই আগের থেকে অনেকটা চরমপন্থার পথ গ্রহণ করেছিল।

অসহযোগ আন্দোলনের থেকে আইন অমান্য আন্দোলন আর একটি দিক থেকে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল তা হল গান্ধিজি অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়ার মতোই লবণ আইন ভঙ্গের নির্দেশ দেন। এর কোনো কর্মসূচি ঘোষণা করেননি কিন্তু লবণ আইন ভঙ্গ যে গণ-জাগরণ ঘটায় তা পূর্বের সমস্ত আন্দোলনকে ম্লান করে দেয়। বস্তুতপক্ষে অসহযোগ আন্দোলনের তুলনায় গ্রামাঞ্চলে এই আন্দোলন যথেষ্ট প্রসার বিস্তার করেছিল। এককথায় দেশপ্রেমের বন্যা বয়েছিল। তাছাড়া তাঁর ডান্ডি অভিযান শুধু ভারতবর্ষে নয় সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গান্ধিজিই প্রথম লবণের প্রশ্নকে গ্রামাঞ্চলের গরিব মানুষের সর্বজনীন ও বাস্তব অসন্তোষের সঙ্গে এবং স্বরাজের আদর্শের সঙ্গে যুক্ত করে এক নতুন রণকৌশলের উদ্ভাবন করে ব্রিটিশকে একেবারে নাস্তানাবুদ করে ছেড়ে দেন। এক্ষেত্রে জমিদারদের কর প্রদান না করার আন্দোলন সামাজিক দিক থেকে বিচ্ছিন্নতামূলক তাৎপ্রয গ্রহম করতে পারত। কিন্তু লবণের প্রশ্ন কৃষকদের কাছে এমন এক আবেদন সৃষ্টি করে যার ফলে সমাজের সংহতির উপর কোনো আঘাত পড়েনি। তাই ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে লর্ড আরউইন গান্ধির কাছে স্বীকার করেছিলেন "You planned a true strategy round the issue of salt"।

গান্ধিজির এই লবণ সত্যাগ্রহের অভিঘাতে সারাদেশে যে এক অশান্ত বিদ্রোহমুখী পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে তা কখনও ইতিপূর্বে কোনো আন্দোলনে দেখা যায়নি। এই আন্দোলনের ব্যাপকতা ও গণজাগরণ ছিল এককথায় অভূতপূর্ব। সুরাট ও কৈরা জেলা সহ দক্ষিণ গুজরাটে লবণ আন্দোলন এক ব্যাপক গণ-আন্দোলনে পরিণত হয়। করাচি, কলকাতা ও মাদ্রাজে পুলিশের

সঙ্গে সংঘর্ষ বাঁধে। ১৮ এপ্রিল চট্টগ্রামে সূর্যসেনের নেতৃত্বে ভারত ইতিহাসের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর সশস্ত্র বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান ঘটে এবং তাঁর নেতৃত্বাধীন ভারতীয় প্রজাতান্ত্রিক বাহিনীর নামে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র প্রচারিত হয়। এবাহিনী স্থানীয় অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করেছিল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে খান আবদুর গফফর খানের নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলনের প্রাবল্য ব্রিটিশ সরকারের মনে প্রথম আতঙ্ক সৃষ্টি করে। অসহযোগ আন্দোলনে গণজাগরণের এতটা প্রাবল্য ছিল না। ২৩ এপ্রিল তাঁর পরিচালিত খুদাই খিদমতগার স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী পেশোয়ারে এক অভূতপূর্ব গণ-অভ্যুত্থান ঘটায়। কিস্মাকহানি বাজারে খুদাই খিদমতগার স্বেচ্ছাসেবক বাহিনি ব্রিটিশ সাজোয়া গাড়ির সঙ্গে প্রকাশ্যে সংগ্রামে লিপ্ত হয়। অবিশ্রান্ত গুলি বর্ষণ উপেক্ষা করে সত্যাগ্রহীরা তিন ঘন্টা সংগ্রাম চালিয়ে যায়। এই পথযুদ্ধে প্রায় তিনশো জন সত্যাগ্রহী প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন। এই মর্মন্তুদ ঘটনা শুধু ভারতবর্ষে নয় সমগ্র বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করে। পেশোয়ারের এই ঘটনার একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিক হল ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে এই প্রথম গাড়োয়ালি রাইফেল বাহিনী নিরস্ত্র মুসলমান সত্যাগ্রহীদের উপর গুলিবর্ষণ করতে অস্বীকার করেছিল। ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দের নৌ বিদ্রোহের আগে এটাই হচ্ছে এ ধরনের প্রথম ঘটনা। এই ঘটনায় ব্রিটিশ সরকার উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল এবং ভারতীয় সৈন্য তাদের কতটা নির্ভরযোগ্য এই প্রশ্নও তাদের মনে নাড়া দিয়েছিল। তাই আইন অমান্য আন্দোলন ভারতের পূর্বেকার সমস্ত আন্দোলনের থেকে সবদিক থেকেই অগ্রগামী ভূমিকা পালন করেছিল।

অসহযোগ আন্দোলনের তুলনায় প্রায় তিনগুণ মানুষ কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। এই আন্দোলনে নারী জাতির প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ছিল প্রগতিশীলতার দিক দিয়ে অনেক অগ্রণী। বিপান চন্দ্র মন্তব্য করেছেন, "For Indian women, the movement was the most liberating experience to date and can truly be said to marked their entry into public space"। এই সময়কালে গান্ধিজি স্বয়ং নারী জাতিকে আন্দোলনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছিলেন। আলোচ্য সময়কালে দেশসেবিকা সংঘ, মহিলা রাষ্ট্রীয় সংঘ প্রভৃতি সংগঠন মহিলাদের আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট করে। কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়, সরোজিনী নাইডু, জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলি, বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, লীলাবতী মুন্সী প্রমুখ এই আইন-অমান্য আন্দোলনে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন। আইন অমান্য আন্দোলনে মহিলাদের ভূমিকায় আঞ্চলিক তারতম্য ছিল। দিল্লিতেই প্রায় দেড় হাজার মহিলা প্রত্যক্ষভাবে আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন। জি .ফরবেস মনে করেন বোম্বাই-এর মহিলারা ছিলেন সবচেয়ে বেশি সংগঠিত। তবে আইন অমান্য আন্দোলন অবশ্য সবদিক দিয়েই অসহযোগ

আন্দোলনের তুলনায় অগ্রবর্তী ছিল না। অধ্যাপক সুমিত সরকার তাই মন্তব্য করেছেন, "Yet it would be a considerable over simplification to present civil disobedience as an unqualified advance in every aspect over non co-operation"। ভারতীয় নারী মুক্তি ও নারী জাগরণের ইতিহাসে আইন অমান্য আন্দোলন ছিল একটি দিক নির্দেশক ঘটনা। নারীরা গৃহকোণে আবদ্ধ না থেকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে শরিক হয়। শিক্ষিতা মহিলারাই একমাত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেননি। অশিক্ষিতা মহিলারাও এই আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বিখ্যাত সাংবাদিক ব্রেলস্‌ফোর্ড মন্তব্য করেন, "যদি আইন অমান্য আন্দোলনের কোনো সুফল না থাকে তথাপি ভারতীয় নারীত্বের মুক্তির জন্য এই আন্দোলন ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করবে"। অধ্যাপক সুমিত সরকার উত্তরপ্রদেশের পুলিশের একজন বড়ো অফিসারের বিবৃতি উদ্ধৃত করে বলেছেন, "Civil disobedience marked in fact a major step forward in the emancipation of Indian Women"।

আইন অমান্য আন্দোলনের আর একটি প্রগতিশীল দিক হল হরিজন সমস্যায় গান্ধিজির আত্মনিয়োগ করা। তিনি অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলনের সূচনা করে ভারতবর্ষে এক নতুন যুগের সূচনা করে। মানবদরদি মন নিয়ে তিনি ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যায় আত্মনিয়োগ করে সকলের মনকে এদিকে আকৃষ্ট করেছিলেন। তাঁর এই কাজের মধ্য দিয়েই সমাজে নীচুতলার অস্পৃশ্য মানুষের মধ্যেও জাতীয়তাবাদের সূচনা হয়। সমাজে এরা ছিলেন অবহেলিত, লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত। গান্ধিজি উপলব্ধি করেছিলেন এদের বাদ দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ হবে না। তাই এদের মধ্যে দিয়ে রাজনৈতিক সচেতনতার সৃষ্টি করে মানবিক অধিকার তারাও যাতে পায় তার চেষ্টা করে তিনি সত্যই 'জাতির জনক' হতে পেরেছিলেন।

আইন অমান্য আন্দোলন অসহযোগ আন্দোলনের থেকেও যে তীব্র আকার ধারণ করেছিল তা ইংরেজের দমননীতর মধ্যেই প্রতিফলিত হয়েছিল। আইন অমান্য আন্দোলন যে অনেক অগ্রণি ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তা ইংরেজের চণ্ডনীতির মধ্যেই লক্ষ করা যায়। এমনকি বড়োলাট লর্ড উইলিংডন গান্ধিজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে রাজি হননি এবং তিনি নিজেই বলেছিলেন 'আমি একজন ক্ষুদ্র মুসোলিনিতে পরিণত হয়েছি'। আইন অমান্য আন্দোলনের আগে কখনও ব্রিটিশের এরূপ ভয়ংকর রূপ ভারতবাসী দেখেনি। প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার মানুষকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। মহাত্মা বলেছিলেন 'সারা ভারতবর্ষই এখন কারাগারে পরিণত হয়েছে'। অর্থাৎ আইন অমান্য আন্দোলন ভারতবর্ষের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে এক নতুন গতির সঞ্চার করেছিল যা দেখে ব্রিটিশ হতভম্ব হয়ে পড়ে। গান্ধিজির ডান্ডি অভিযান শুধুমাত্র

ভারতবর্ষেই সীমাবদ্ধ ছিল না, সমগ্র বিশ্ববাসীকে অনুপ্রাণিত করেছিল। ইংরেজ সরকার নিরীহ, নিরপরাধ সত্যাগ্রহীদের উপর যে নির্মম অত্যাচার করেছিল তাতে বিশ্ব জনমত ভারতের অনুকূলে গিয়েছিল। গান্ধিজি একজন রাজনৈতিক নেতা অপেক্ষা মানবদরদি নেতা হিসাবেই বিশ্ববাসীর কাছে পরিচিত হন। ভারত এই আন্দোলনের মাধ্যমে 'স্বরাজ' পায়নি সত্য কিন্তু 'স্বরাজ' লাভের পথ এই আন্দোলনই ভারতবাসীর কাছে উন্মুক্ত করে দিয়েছিল।

এই সমস্ত দিক পর্যালোচনা করলে অসহযোগ আন্দোলন অপেক্ষা আইন অমান্য আন্দোলন গুণাতীতভাবে অগ্রণী ও প্রগতিশীল ছিল বলা যায়। কিন্তু ড. সুমিত সরকার মনে করেন যে, 'অসহযোগ আন্দোলন অপেক্ষা আইন অমান্য আন্দোলনকে গুণগত দিক থেকে অধিকতর প্রগতিশীল বা অগ্রসর ছিল মনে করলে অতি সরলীকরণ করা হবে'। এটা ঠিক দু'একটি ক্ষেত্রে আইন অমান্য আন্দোলন অসহযোগ আন্দোলন অপেক্ষা পিছিয়ে ছিল। আইন অমান্য আন্দোলন মুসলিম সম্প্রদায়কে তেমনভাবে আকর্ষণ করতে পারেনি। একমাত্র সীমান্ত গান্ধি আবদুর গফফর খানের নেতৃত্বে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে মুসলমানরা গণবিদ্রোহের সূচনা করেছিল কিন্তু ভারতবর্ষের কোথাও মুসলমানদের এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ তেমনভাবে চোখে পড়েছনি। অথচ অসহযোগ আন্দোলনের সময় হাজার হাজার মুসলিম কংগ্রেসের পতাকাতলে সমবেত হয়ে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য যে জাতীয় আন্দোলনের মূল সূত্র তা প্রমাণ করে এবং ইংরেজের ভেদনীতিকে পরাস্ত করে। আইন অমান্য আন্দোলনের সময় জাতীয়তাবাদে মুসলিম ছাড়া সকলেই আন্দোলন থেকে দূরে ছিলেন। তাছাড়া, আইন অমান্য আন্দোলনে বিশেষ কিছু স্থান ও সময় ছাড়া শ্রমিকরা এই আন্দোলনে উৎসাহ দেখায়নি। আবার এটাও সত্য কমিউনিস্ট পার্টি থেকে শ্রমিকদের আইন অমান্য আন্দোলনে ডাক দেওয়া হয়নি। মধ্যবিত্ত শ্রেণিও আইন অমান্য আন্দোলনে ততটা উৎসাহ দেখায়নি। তা সত্ত্বেও বলা যায় আইন অমান্য আন্দোলন অসহযোগ আন্দোলন অপেক্ষা গুণাতীতভাবে অগ্রণী বা প্রগতিশীল ছিল।

— ০ —